মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩২॥ জুন ২০২৫
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v60i3.1
প্রবন্ধ জমাদান: ১৩ এপ্রিল ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ২২ জুন ২০২৫
পৃষ্ঠা: ১-২১

রাজর্ষি থেকে *বিসর্জন*: পুরোহিততন্ত্র-রাজক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও বলির বিলোপ

সৌমিত্র শেখর
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: soumitra@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বিসর্জন* নাটকে প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্বই মুখ্য—এতদিন ধরে আলোচিত হওয়া এই বিষয়ের বাইরে নতুন একটি পর্যবেক্ষণ বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের লড়াই ঐতিহাসিকভাবে যেমন সত্য, তেমনি বিশ্বসাহিত্যেও এর নানা মাত্রায় রূপায়ণ আছে। *বিসর্জন* নাটকে মূলত পুরোহিততন্ত্র ও রাজক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে প্রতিভাত হয়েছে এবং শেষ অবধি অমানবিক বলিপ্রথা বন্ধের মধ্য দিয়ে পুরোহিততন্ত্রের ঘটেছে পরাজয়—এই প্রতীতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে প্রবন্ধটিতে। প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে *রাজর্ষি* উপন্যাস, যে উপন্যাসকে অবলম্বন করে নাটকটি রচিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছিলেন। *রাজর্ষি* ও *বিসর্জনের* প্রয়োজনীয় তুলনা করে কেন রবীন্দ্রনাথ ঘটনার প্রেক্ষাপট ত্রিপুরায় নিয়ে গেলেন, সে প্রসঙ্গও প্রবন্ধটিতে আলোচিত। বলির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং এর ধর্মীয় পরিধি-প্রয়োগ আলোচনাসহ বর্তমান ত্রিপুরাতে বলি বন্ধের আইনি নির্দেশ তুলে ধরে *বিসর্জন* নাটকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-বক্তব্যের যাথার্থ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা আছে এই প্রবন্ধে।

মূলশব্দ

পুরোহিততন্ত্র, রাজক্ষমতা, ত্রিপুরারাজ, প্রেম, প্রতাপ, বলিপ্রথা, জীবহত্যা, ত্রিপুরেশ্বরী, পশুপ্রেম, রাজরক্ত।

পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা কত তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, অনুমান করা যায় মাত্র। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের বাইরেও অনেক মানুষ জীবনযাপন করছেন। বহু ধর্মে সৃষ্টিকাল থেকেই নরবলি, জীববলি ইত্যাদি ছিল। অনেক ধর্মে এগুলো আংশিক রদ হয়েছে, বহু ধর্মে বন্ধ হয়েছে। এই বন্ধ বা রদকরণের প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) লেখা *রাজর্ষি* (১৮৮৭) উপন্যাস ও *বিসর্জন* (১৮৯০) নাটকে বলিপ্রথা রদকরণের প্রত্যয় ঘোষিত। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। জীবনব্যাপী তাঁর নানামুখী ভাবনা বাঙালি পাঠককে আকৃষ্ট করে। কারণ, তিনি যে চিন্তা করেছেন অথবা ভাবনা ভেবেছেন, বাঙালিযাত্রার আগ্রবর্তিতায় তা কোনো-না-কোনোভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও যে সবসময় একই ভাবনা ভেবেছেন অথবা এক ভাবনাতেই স্থির থেকেছেন, তা নয়। এই ভাবনার সঞ্চরণ তাঁর গদ্যরচনাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সৃষ্ট সাহিত্যকর্মেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনার প্রকাশ, সঞ্চরণ ও স্থিতির নিদর্শন রেখেছেন। এমনই দুটো সাহিত্যকর্ম *রাজর্ষি* উপন্যাস ও *বিসর্জন* নাটক; যেগুলো রচনার সময় তাঁর বয়স যথাক্রমে ছাব্বিশ ও উনত্রিশ বছর। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে *রাজর্ষি*তে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনা প্রকাশ করেছেন বহুবিস্তৃতভাবে, তিন বছর পরে প্রকাশিত *বিসর্জন* নাটকে সেই চিন্তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং সেখানেই রবীন্দ্র-ভাবনার সুনির্দিষ্ট স্থিতি লক্ষ করা গেছে। সেই স্থিতিবিন্দু বাঙালির আধুনিকতার অভিযাত্রায় আজও প্রাসঙ্গিক।

১

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশ কয়েকটি রচনাকে অবলম্বন করে নাট্য-সৃজন করেছেন। এর মধ্যে উপন্যাসও রয়েছে। যদিও *বউ ঠাকুরানীর হাট* (১৮৮৩) উপন্যাস *রাজর্ষি*র আগে লেখা, তবু *রাজর্ষি* তাঁর প্রথম উপন্যাস, যে উপন্যাস অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন নাটক এবং তার নাম *বিসর্জন*। এরপর অবশ্য তিনি *বউ ঠাকুরানীর হাট* অবলম্বনে লেখেন *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯০৯); *প্রজাপতির নির্বন্ধ* (১৯০৮) অবলম্বনে লেখেন *চিরকুমার সভা* (১৯২৬)। সবগুলো রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।[১] এই তিনটি নাটকের মধ্যে *বিসর্জন* রচিত হয়েছিল আগে এবং বাংলাদেশে বসে এটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে জোড়াসাঁকোতে ফিরে জানতে পারেন, ঠাকুরবাড়ির বালকেরা একটি নাটক মঞ্চায়নের কথা চিন্তা করছে এবং তাদের ভাবনায় আছে, *বউ ঠাকুরানীর হাট*কে নাট্যরূপ দেওয়ার। রবীন্দ্রনাথের সতেরো বছর বয়সী ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (১৮৭২-১৯৪০; পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাঁকে একটি নতুন নাটক লেখার জন্য অনুরোধ করে নিজহাতে বাঁধিয়ে সুন্দর খাতা উপহার দেন। এর কিছুদিন পরই জমিদারি কাজে রবীন্দ্রনাথের সাহাজাদপুরে (রবীন্দ্রনাথ লিখিত বানান ব্যবহার করা হয়েছে) আগমনের কর্মসূচি থাকায় তিনি সাহাজাদপুরে চলে আসেন এবং গ্রামীণ পরিবেশে বসে সেই প্রস্তাবমতো নাটক রচনা করেন আর সেটার নাম দেন *বিসর্জন*।[২]

নাটক লেখা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ উৎসর্গ-কবিতা লেখেন, সেখানে প্রথমেই সুরেন্দ্রের নিজহাতে বাঁধিয়ে কবিকে উপহার দেওয়া সুন্দর খাতাটির উল্লেখ আছে এবং আছে ঠাকুরবাড়ির ছোটোদের আবদার-প্রসঙ্গ।[৩] *বিসর্জন* রচিত হলো। রচনাকাল ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ; রচনাস্থান সাহাজাদপুর। এ কথা নিশ্চিত যে, ঠাকুরবাড়িতে মঞ্চায়ন করার জন্য ভ্রাতুষ্পুত্র নবীন-যুবা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ *বিসর্জন* লিখেছিলেন এবং

রচনাবর্ষেই (১৮৯০) রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন (এরপরও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে অভিনয় করেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে, বৃদ্ধ বয়সে যুবক জয়সিংহের চরিত্রেও তিনি অভিনয় করেছিলেন) (শুভঙ্কর, ১৪০৫: ২৫)। তবু, *বিসর্জন* নাটকপাঠের মাহাত্ম্য শুধু এটুকুতে সীমাবদ্ধ নেই। ছোটোদের আবদারের পরিপ্রেক্ষিতে *বিসর্জন* রচিত হলো বটে, কিন্তু সেটি আর থাকল না 'ছোটোদের নাটক'; গভীর বাণীবহ চিরায়ত এক বাংলা নাটকে পরিণত হলো।

২

বিসর্জন নাটকে বহু বিষয় যুক্ত হয়েছে: প্রজাবৎসলতা, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের জটিলতা, অপত্যস্নেহের ধারা, মানবিক প্রণয়। তবে, এতে পুরোহিততন্ত্র ও রাজক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্বটি বেশ প্রবল; বলা চলে, মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ইতিহাস জানতেন। তিনি পাশ্চাত্য যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের লড়াই সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখতেন। এর সঙ্গে ভারতীয় সমাজের কোনো পার্থক্য আছে কি নেই, তাও তিনি লিখেছেন অনেক প্রবন্ধে। গ্রিকসভ্যতার প্রাণসঞ্চার কেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে, তার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতারই-বা পার্থক্য কী, এমন এক আলোচনায় ভারতবর্ষ গ্রন্থের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'ইজিপ্টে এক পুরোহিতশাসনতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; তাহার আচারব্যবহারে, তাহার কীর্তিস্তম্ভগুলিতে, ইহারই একমাত্র প্রভাব। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে একভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহারা সেই কর্তৃভাবের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৯৮০খ: ৭২৭)। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রিসের সঙ্গে ভারতের তুলনা করে প্রাগুক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন:

> এইরূপ এক ভাবের কর্তৃত্বে ভিন্ন দেশ ভিন্ন রূপ ফললাভ করিয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্যবশত গ্রীস অতি আশ্চর্য দ্রুতবেগে এক অপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর-কোনো জাতিই এত অল্পকালের মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রীস তাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার অবনতিও বড়ো আকস্মিক। যে মূলভাবে গ্রীক সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল; আর-কোনো নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার স্থান অধিকার করিল না। অপর পক্ষে, ভারতবর্ষে সভ্যতার মূলভাব এক বটে, কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল; তাহার সরলতায় সমস্ত যেন একঘেয়ে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ টিকিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হইয়া গেল। (রবীন্দ্রনাথ ১৯৮০খ: ৭২৭)

বিসর্জন নাটকে এই 'বদ্ধ' হওয়া বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। আর এই পর্যবেক্ষণ শুধুই একজন সাহিত্যিকের নয়।

৩

নতুন নাটক লেখার জন্য *রাজর্ষি* উপন্যাসগ্রন্থটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন এবং *রাজর্ষি* অবলম্বন করেই *বিসর্জন* নাটক লেখেন। *রাজর্ষি* ছিল সে সময় রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রকাশিত উপন্যাস। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। এরও দুবছর আগে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বালক পত্রিকায় *রাজর্ষি* ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে। শুধু তাই নয়, *বালকে* ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের সময় নিয়ে 'মুকুট' নামে সে বছরই একটি ছোটোগল্পও লেখেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও এ সময় 'মুকুট'কে 'ছোটো উপন্যাস' আর *রাজর্ষি*কে 'বড়ো উপন্যাস' বলা হয়েছে।[৪] *রাজর্ষি* গ্রন্থাকারে প্রকাশের ঠিক তিন বছর পর, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন উনত্রিশ বছর, তখন তিনি লেখেন *বিসর্জন*। *রাজর্ষি*র প্লট-সৃজন ও প্রকাশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন:

> বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবউঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়েছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু, শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-এক দিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম কোন্-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা এ কী! এ যে রক্ত!' বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া *রাজর্ষি* গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগলাম। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৮৮: ১৪৪-১৪৫)

বালক ছিল ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক মাসিক পত্রিকা। ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে প্রকাশ পায়। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের মেঝো বৌঠাকুরানি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন এর সম্পাদক আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন 'কার্যাধ্যক্ষ'। 'স্বপ্নলব্ধ' প্লট নিয়ে *বালকে* রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন *রাজর্ষি* এবং এতে পুরাবৃত্ত মেশান ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের। উল্লেখ্য, *বালক* বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ উপন্যাস পত্রিকাটিতে বের হওয়া সম্ভব হয়নি।

ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেন এক আত্মিক সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারতের সেই পাহাড়ি জনপদে তিনি বহুবার গমন করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, *রাজর্ষি* বা *বিসর্জন* যখন তিনি রচনা করেন কিংবা লেখেন 'মুকুট' ছোটোগল্প, তখন পর্যন্ত তিনি একবারও ত্রিপুরাতে যাননি। এগুলো রচনার বহু বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাতে গমন করেন।[৫] রবীন্দ্রনাথ প্রথম ত্রিপুরাতে গমন করেন ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, মহারাজা

রাধাকিশোরমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৮৯৭-১৯০৯) আমন্ত্রণে। যদিও সব মিলিয়ে সাত বার রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাতে গিয়েছেন, তবু এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, *রাজর্ষি* বা *বিসর্জন* রচনার সঙ্গে রাজপরিবার ও লেখকের ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্টতা বা বাধ্যবাধকতা ছিল। বলি, রক্ত ইত্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্নলব্ধ' গল্পটি কোনো রাজা-সংশ্লিষ্ট করে উপস্থাপন করা হয়েছে *রাজর্ষি* ও *বিসর্জনে*। আমাদের মনে হয়, এটি ত্রিপুরার রাজা না হয়ে ভাওয়ালের রাজাও হতে পারতেন। কিংবা হতে পারতেন অন্য কোনো রাজা। ত্রিপুরারাজ্য গৃহীত হওয়ার কারণ বোধকরি, ত্রিপুরার ইতিহাসগ্রন্থ *রাজমালা* (১৩০৩) রবীন্দ্রনাথের পড়া ছিল। এর লেখক *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ (১৮৫১-১৯১৪)—যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) কৈলাসচন্দ্র সিংহকে 'রবীন্দ্রবাবুর নায়েব' বলেছিলেন (প্রভাতকুমার ১৩৯২: ২২০)। বালক পত্রিকায় *রাজর্ষির* অনেকগুলো কিস্তি বের হয়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজাকে তাঁদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দমাণিক্য (?-১৬৭৬) সম্পর্কে অধিকতর তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন। পত্রে তারিখ ছিল না। অনুমান করা হয়েছে, ২৩শে বৈশাখ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পত্রটি লেখেন এবং তাতে তাঁর বক্তব্য:

> মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রাজর্ষি নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিব। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্বাসন দশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন, যদি জানিতে পাই, তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। (সত্যরঞ্জন ২০১১: ৮)

অধুনালুপ্ত *রবি* পত্রিকার ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা থেকে পত্রটি গৃহীত। তা ছাড়া রাজপরিবারে রক্ষিত থাকা পত্রটি সে সময় কলকাতায় প্রদর্শিতও হয়েছে। এই পত্রের উত্তর রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এবং সেখানে মহারাজা বীরচন্দ্র (রাজত্বকাল ১৮৬২-১৮৯৬) পারিবারিক ইতিহাসের তথ্য পাঠিয়ে লিখেছিলেন, 'ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্খলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না' (সত্যরঞ্জন ২০১১: ৯)। এতে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-উপস্থাপনায় মাণিক্য-রাজাদের অসমর্থন ছিল না।

১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা ব্রিটিশদের 'কুক্ষিগত' হলেও সেখানে পৃথক রাজকেন্দ্রিকতাসহ স্বল্প-স্বাধীনতা বজায় থাকে।[৬] ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ভারত ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার আগপর্যন্ত মাণিক্য-রাজাদের অধীনে ছিল ত্রিপুরা। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকর্মে যে সময়টি ধরতে চেয়েছেন, সে সময়ের জন্য ভারতের মূল অংশ থেকে পৃথক কিন্তু বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্বস্পর্শী ছিল ত্রিপুরার রাজা। আর এজন্যই উল্লেখিত প্রেক্ষপট নির্বাচন করা ছিল যথাযথ। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজাগণ যেভাবে এসেছেন, সে তুলনায় উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজাদের উপস্থিতিও ছিল কম। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সে শূন্যতা খানিকটা হলেও মিটেছে।

৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *রাজর্ষি* উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে জানিয়েছেন, সাময়িকপত্রে যেহেতু কিস্তিতে উপন্যাসটি বের হয়েছিল, সেহেতু সাময়িকপত্রের প্রয়োজনেই উপন্যাসটি দীর্ঘ হয়েছে।[৭] উপসংহারসহ পঁয়তাল্লিশটি পরিচ্ছেদে *রাজর্ষি* সম্পন্ন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোবিন্দমাণিক্য মহারাজা; তবে তিনি রাজা হয়েও ঋষির জীবন গ্রহণ করবেন এবং *রাজর্ষি* হিসেবে অভিহিত হবেন—সাময়িকপত্রে উপন্যাস রচনার সময় শুরু থেকে এমনটাই পরিকল্পনা লেখক করেছিলেন বলে মনে হয়। তা না হলে এমন নামকরণ শুরুতেই তিনি করবেন কেন? ত্রিপুরার ইতিহাসগ্রন্থ *রাজমালায়* গোবিন্দমাণিক্য সম্পর্কে দুধরনের ইতিহাস পাওয়া যায় (কৈলাসচন্দ্র ১৩০৩: ৮৪-৮৬)। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৬২৬-১৬৬০) মৃত্যু (১৬৬০) হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ গোবিন্দদেব ঠাকুর ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) গোবিন্দমাণিক্য নাম ধারণ করে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্ররায় এতে ক্ষুব্ধ হন এবং সুলতান সুজার সাহায্য নিয়ে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ভ্রাতৃশোণিতে মৃত্তিকা রঞ্জিত করতে চাননি বলে গোবিন্দমাণিক্য বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করে চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় চলে যান। অন্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নক্ষত্ররায় বিজয়ী এবং গোবিন্দমাণিক্য পরাজিত হন। ছত্রমাণিক্য নামগ্রহণ করে নক্ষত্ররায় ১০৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। ছয় বছর রাজত্ব করার পর নক্ষত্ররায় মৃত্যুবরণ করলে গোবিন্দমাণিক্য আবার ত্রিপুরার মহারাজ হয়েছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালের দুই পর্ব: প্রথমটি ১৬৬০-১৬৬১; দ্বিতীয়টি ১৬৬৭-১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ। দানশীল ও দয়াবান মহারাজা ছিলেন তিনি। তাঁর পুত্রের নামও পাওয়া যায়: যুবরাজ রামদেব ঠাকুর। ইতিহাসের এই উপাদান গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *রাজর্ষি* উপন্যাসে যে কাহিনি উপস্থাপন করেন তা বেশ আকর্ষণীয়।

এই উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায়, সন্তানহীন রাজা গোবিন্দমাণিক্য গোমতী নদীতে স্নান করতে যান এবং সেখানে হাসি ও তাতা নামের দুটি ছোটো ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরিচিত হন, যাদের খুড়ার নাম কেদারেশ্বর। হাসি ও তাতার সঙ্গে রাজার স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে একশ মোষ বলি দেওয়ায় যে রক্তস্রোতের সৃষ্টি হয় তার দাগ দেখে হাসি রাজাকে জিজ্ঞেস করে, 'এত রক্ত কেন!' হাসি আঁচল দিয়ে নদীর ঘাট মুছতে থাকে; তাতাও তাকে অনুসরণ করে। এই কাজের পরেই হাসি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং জ্বর তীব্রতর হতে থাকে। রাজবৈদ্য এসেও তাকে সুস্থ করতে পারেন না। হাসি প্রলাপ বকে, 'মাগো, এত রক্ত কেন!' গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়। এরপর রাজা ঘোষণা করেন, 'এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।' মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রঘুপতি ও রাজার সহোদর ভাই নক্ষত্ররায় এই ঘোষণা মেনে নিতে পারেন না। তারা বলেন, বলিদান প্রথা বন্ধ হলে রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ষড়যন্ত্র করেন এবং গোবিন্দমাণিক্যের বদলে নক্ষত্ররায় সিংহাসনে বসবেন বলে ঠিক হয়। রঘুপতি জনতাকেও বিদ্রোহ করতে ইন্ধন দেন। তাতাকে গোবিন্দমাণিক্য সন্তানের মতো স্নেহ করেন এবং নাম দেন ধ্রুব। রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় তাতা অর্থাৎ ধ্রুবকে বলিদানের জন্য গোপনে মন্দিরে নিয়ে আসেন। এই চক্রান্ত ধরা পড়ে গেলে সেই অপরাধে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের শাস্তি হয়।

ত্রিপুরা থেকে নির্বাসিত রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় মোগলসম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাসুজার সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। যুদ্ধ না করে গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য ছেড়ে দেন। রাজ্যত্যাগের পর সন্ন্যাসীবেশে গোবিন্দমাণিক্য যে স্থানগুলোতে গমন করেন, তা মূলত আজকের বাংলাদেশে। রবীন্দ্রনাথ নিজে না এসেও অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই ভূগোলটি অঙ্কন করেছেন, এটি বড়ো আনন্দের। গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যান। রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি জেলার ময়ানি (বর্তমান নাম মাইনি) নদীর ধারে কুটির স্থাপন করেন তিনি। সেখান থেকে সন্ন্যাসীবেশে যান দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামুর নিকটবর্তী আলমখাল নামক গ্রামে। সেখানেও তিনি পাঠশালা খোলেন, সাধারণ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানে আওরঙ্গজেবের তাড়ায় পলায়নপর শাসুজার সঙ্গে দেখা হয় গোবিন্দমাণিক্যের। ভাই আওরঙ্গজেবের প্রেরিত সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য গোবিন্দমাণিক্যের সহযোগিতায় শাসুজা আরাকানের দিকে গমন করেন। ছয় বছর পরে নক্ষত্ররায়ের মৃত্যু হয় এবং প্রজাদের অনুরোধে গোবিন্দমাণিক্য আবার ত্রিপুরায় ফিরে গিয়ে রাজত্ব গ্রহণ করেন। রঘুপতিও দায়িত্ব নেন পুরোহিতের। তিনি আগেই গোমতীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে নতুন চেতনায় স্নাত হয়েছেন। উপন্যাসের শেষে আরম্ভ হয় এক নবযাত্রা; যার কান্ডারি গোবিন্দমাণিক্য।

উপন্যাস হিসেবে *রাজর্ষি* কতটুকু সফল সে আলোচনা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। আগ্রহী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকমাত্রই জানেন, *করুণা* (*ভারতী*তে প্রকাশিত ১২৮৪-১২৮৫), *বউ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি*—উপন্যাস হিসেবে রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম পর্যায়ের রচনা। *বউ ঠাকুরানীর হাটে* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবও পরিদৃষ্ট। সুকুমার সেন অবশ্য বলেছেন, '*রাজর্ষি*তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া গিয়াছে' (সুকুমার ১৯৫২: ২৪৫)। এখানে 'সম্পূর্ণভাবে' পদটি ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক তোলা যায়। তারপরও এ কথা বলা সঙ্গত যে, *রাজর্ষি*তে রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। ছোটোদের পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে *রাজর্ষি* ছোটোদের রচনা হয়ে পড়েনি, অথবা হয়ে যায়নি ইতিহাস অবলম্বনে 'শিশুসুলভ গল্পকথা'। ইতিহাসের গোবিন্দমাণিক্য-কথা আর *রাজর্ষি* উপন্যাসে কাহিনিতে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। ইতিহাসে গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায় হলেন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আর উপন্যাসে তারা সহোদর ভাই। ইতিহাসে হাসি ও তাতার চরিত্র অনুমোদন করে না। অথচ, উপন্যাসে এ দুটো চরিত্রই ঘটনা-সংঘটনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। এ ছাড়া ইতিহাস ও উপন্যাস-কাহিনিতে আরো অনেক পার্থক্য দেখা যায়। উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্য 'মহারাজা' থাকতে চাননি, হতে চেয়েছেন 'মানুষ'। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, 'আমি [গোবিন্দমাণিক্য] ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিব। আমি প্রথম হইতে ধ্রুবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিব। ধ্রুবের সহিত তিলে তিলে আমিই বাড়িতে থাকিব। আমার মানবজন্ম সম্পূর্ণ করিব। ঠাকুর, আমি মানুষের মতো নই, আমি রাজা হইয়া কী করিব!' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৮: ১০৩)। 'মানুষ' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নীরবে কাজ করেছে গোবিন্দ্যমাণিক্যের মধ্যে, যে মানুষ হওয়ার পথসন্ধান আছে পুরো রবীন্দ্রসাহিত্যেই। শুধু তাই নয়, এক মানুষ থেকে আরেক মানুষে মনুষ্যত্বের সঞ্চরণ-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে এখানে। ভূদেব চৌধুরী প্রাসঙ্গিকভাবে তাই উল্লেখ করেছেন, 'পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-কল্পিত "মানুষের ধর্ম"-এর সাধনার পূর্বসূত্র এখানে স্পষ্ট বিমূর্ত হতে দেখি। আর এ কথাও মানতেই হবে, এই গভীর

নিবিড় জীবন-ভাবনা কখনোই শিশু-মানসিতার উদ্দেশ্যে উৎসারিত হওয়া সম্ভব নয়' (ভূদেব ১৮৮৪: ২৮)। এভাবেই *বালক* পত্রিকায় ছোটোদের লক্ষ্য করে লেখা *রাজর্ষি* উপন্যাসটি বড়োদের সদর দরজায় গিয়ে পৌঁছে। মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য একটি আদর্শ ও অনুসরণীয় চরিত্র হিসেবে শ্রদ্ধার্হ হয়ে ওঠেন।

৫

স্বপ্নলব্ধ প্লট *রাজর্ষি*র মধ্য দিয়ে *বিসর্জনে* অনেক বেশি পরিণত হয়েছে। *বিসর্জন রাজর্ষি*র মতো কোনো একক-চরিত্রের মাহাত্ম্যগাথা নয়; এটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের নাম। স্বপ্নে প্লট পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁর ভাষায়: 'আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংসা পূজার সঙ্গে হিংস্রের শক্তিপূজার বিরোধ' (রবীন্দ্রনাথ ১৯৮০ক: ৩৪২)। *রাজর্ষি*তে তিনি 'মাসিক পত্রের পেটুক দাবি' পূরণ করতে গিয়ে এই বিরোধটি গৌণ করে ফেলেন, মুখ্য হয়ে ওঠেন '*রাজর্ষি* গোবিন্দমাণিক্য' ব্যক্তিমানুষটি। রবীন্দ্রনাথ *রাজর্ষি* সম্পর্কে যদিও উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে বলেছেন, 'বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে' (রবীন্দ্রনাথ ১৯৮০ক: ৩৪২)। কিন্তু এরপর আরো তিরিশটি পরিচ্ছেদ তিনি লিখেছেন *রাজর্ষি*র জন্য। আর এতেই উপন্যাসটির ভরকেন্দ্র গিয়ে পড়েছে '*রাজর্ষি* গোবিন্দমাণিক্য' ব্যক্তিমানুষের ওপর। *বিসর্জন* তা নয়। নাটকটি নানাভাবে একাধিকবার পরিবর্তন ও সংস্কার হয়েছে। *বিসর্জনে*র পাঠ অল্প-বিস্তর একাধিকবার পরিবর্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। 'পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, কাব্যগ্রন্থাবলী ও দ্বিতীয় সংস্করণের আধারে, নূতন একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন—উহাই বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৬৮: গ্রন্থপরিচয়)। রবীন্দ্রনাথ অনুমোদিত শেষ সংস্করণে দেখা যায়, *বিসর্জন* বিরোধের নাটক—প্রেম আর প্রতাপের বিরোধ। পুরোহিত রঘুপতির প্রতাপ আর মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রেম। দুটো পক্ষ হয়ে গিয়েছিল। প্রতাপের সঙ্গে মিশেছিল হিংসা; প্রেমের সঙ্গে মেশে ক্ষমা! কোন পক্ষ জয়ী হয়? শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ নিজে *বিসর্জন* পড়াতেন। অধ্যাপনাকালে তিনি নাটকটির পরিণতি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়।' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ১২২)

বিসর্জন নাটকের কাহিনিতে বলা হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯): ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সন্তানহীন স্ত্রী গুণবতী সন্তানলাভের আশায় দেবীর কাছে একশ মোষ আর তিনশ ছাগ বলি দেওয়ার মানত করে। ভিখারিনি বালিকা অপর্ণার একমাত্র সম্বল ছাগশিশুটি, যাকে সে মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে পালন করত, সেটিকে ধরে এনে বলি দেওয়া হলে অপর্ণা রাজার কাছে বিচার দেয়। তাকে বলা হয়, দেবী ছাগশিশুটি গ্রহণ করেছেন। এ কথায় অবিশ্বাস জানায় অপর্ণা। বলে, 'মা তাহারে নিয়েছেন?/ মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ১৮)। রাজা গোবিন্দমাণিক্য এরপর থেকে মন্দিরে জীববলি নিষিদ্ধ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন পুরোহিত রঘুপতি। তিনি রানি গুণবতী, রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়, মন্দিরের সহযোগী জয়সিংহ প্রমুখকে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে প্ররোচিত করেন। প্রজাদেরও উত্তেজিত করেন তিনি। অবশেষে করেন ষড়যন্ত্র—গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করে নক্ষত্ররায়কে রাজা বানানোর। কিন্তু এ সবই ব্যর্থ হয়। জটিল ঘটনাপ্রবাহের পর রঘুপতিও নিজের অবস্থান যে ভুল, তা বুঝতে পারেন এবং দেবীমূর্তি গোমতীজলে বিসর্জন দেন। অবশেষে দেবীমন্দিরে বলি চিরতরে বন্ধ হয় এবং অপর্ণার

মধ্যে দেবীদর্শন অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অধিষ্ঠান—এই বাণী ঘোষণার মাধ্যমে নাটকটির সমাপ্তি ঘটে।

৬

বলিপ্রথা চিরদিনের জন্য বন্ধ করার পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এক্ষেত্রে রাজা গোবিন্দমাণিক্য সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু তাতে *বিসর্জন* নাটকটি চরিত্রবিশেষের কৃতিত্ব-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েনি। *বিসর্জন* বক্তব্য-প্রধান নাটক এবং এতে হিংসা ও প্রতাপের উপর প্রেমের জয় বিঘোষিত। এখানে হিংসা ও প্রতাপের বাহ্যপ্রকাশ বলিপ্রদান। এটি একটি দীর্ঘদিনের প্রথা। শুধু হিন্দুধর্মেই বলিপ্রথা অনুমোদিত তাও নয়। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বের নির্দিষ্ট ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ত্যাগের উপাদানগুলিকে বিভিন্ন এবং প্রায়শই জটিল উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বৈচিত্র্য এবং জটিলতাকে ধারণ করে বহু ধর্ম বলিদান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনও করেছে। ভারতে বৈদিক যুগে এবং পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মে আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে, বিশেষত শাক্ত মতের অনুসারীদের জন্য বছরের পর বছর ধরে বাধ্যতামূলক বলিদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হতো। এখনও শাক্তমন্দিরগুলোতে বলিদানপ্রথা প্রচলিত আছে। ব্যক্তির জন্য বলিদান বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মানত রক্ষার জন্য বলিদান করা যেতে পারে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মে বলিদানপ্রথার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এখন পশুবলির বদলে ফলবলি বহু মন্দিরে অনুমোদিত। ভারতে সৃষ্ট ধর্ম জৈন[৮] ও বৌদ্ধধর্মে[৯] পশুবলিদান বিকশিতই হয়নি। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম নীতিগত বলিদান বলে আত্ম-শৃঙ্খলার কাজকে বুঝিয়েছে এবং মহাবীর বা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে ধূপের মতো ভক্তিমূলক নৈবেদ্যের ধারণার উপর জোর দিয়েছে।

চীনে বিভিন্ন ধর্মের অন্য দিকগুলির মতো বলিদানও বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন চীনে উপাসনার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল স্বর্গ ও পৃথিবীতে সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত বিস্তৃত বলিদান। একজন শাসকের মৃত্যুর সঙ্গে অন্য মানব বলিদানের দৃষ্টান্তও রয়েছে। কারণ, জীবদ্দশায় তার সেবাকারীদের সঙ্গে মৃত্যুর সময় তার সঙ্গী হওয়া উচিত বলে মনে করা হতো। বলিপ্রথার ক্রমাগত পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে চীনে বৌদ্ধধর্ম এবং তাওবাদের মতো প্রতিষ্ঠিত ধর্ম আজ তা শূন্যে নামিয়ে এনেছে। প্রাচীন জাপানে ধর্মে দেবতার নামে নৈবেদ্য প্রদান মুখ্য ছিল। পরে সম্রাট সবার নৈবেদ্য নিজে দেওয়ার নামে বলিপ্রথা শুরু করেন। প্রাকৃতিক দেবতার উদ্দেশ্যে এবং সমাধিস্থলে মানব বলিদান একসময় সাধারণ ছিল; কিন্তু মধ্যযুগের প্রথম দিকে সেটি পরিত্যক্ত হয়েছে। শিন্টো নামে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী ধর্মও এখন পরিবর্তিত সময়ে বলিপ্রথা থেকে নিবৃত্ত রয়েছে। আর সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছেও পশুবলি গর্হিত কর্ম। প্রাচীন গ্রিসের হোমেরিক কবিতাগুলিতে বলিদানের আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। এই আচার-অনুষ্ঠান, যা প্রায় দশ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই রক্ষিত ছিল। এগুলোকে থাইসিয়া ও স্ফ্যাগিয়া বলা হতো। হেলেনিস্টিক যুগে এই প্রথা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এখন তা আর নেই।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে বেইথ হামিকদাশ বা দ্বিতীয় সিনেগগ ধ্বংসের ফলে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের উপাসনায় এক গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। সেই ঘটনার আগে, বলিদান ছিল ইসরায়েলীয়

উপাসনার কেন্দ্রীয় কাজ এবং ইহুদিদের ইতিহাস জুড়ে অনেক ধরনের বলিদানের রীতিনীতি বিকশিত হয়েছিল। সিনেগগ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বলিদানের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায় এবং বিশেষ প্রার্থনা বলিদানের স্থান নেয়। আধুনিক ইহুদি ধর্মে এখনও অর্থোডক্স প্রার্থনা বইগুলিতে পুনর্নির্মিত সিনেগগে বলিদানের ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা রয়েছে। তবে, সংস্কারমূলক ইহুদি ধর্ম এই প্রার্থনাগুলিকে বাতিল বা সংশোধন করেছে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলিতে বলিদানের ধারণাটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হয়েছিল। শেষ নৈশভোজের আগে ক্রুশে যিশু খ্রিষ্টের মৃত্যুকে বলিদানমূলক ভাষায় বর্ণনা করা হয়। খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মতে খ্রিষ্টের বলিদান ছিল অনন্য এবং যথেষ্ট (Maria-Zoe Petropoulou)। তাই ধর্মানুষ্ঠানে এটি পুনরাবৃত্তি করার ধারণাটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রাক-ইসলামিক আরবদের মধ্যে বলিদানের প্রথা ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বব্যাপী ইদুল আজহায় ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পশু (ভেড়া, খাসি, উট, গরু ইত্যাদি) কোরবানি করে থাকে। কারণ, তাদের প্রধান ধর্মীয়গ্রন্থ *কোরআন শরিফের* সুরা বাকারা, সুরা মায়েদা, সুরা আনআম, সুরা হজ, সুরা আস-সাফফাত ইত্যাদির নানা আয়াতে কোরবানির কথা বলা হয়েছে। মুসলিমদের মধ্যে শুরু থেকে আজ অবধি এই কোরবানিপ্রথা চলে আসছে। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে Britanica-য় উল্লেখকৃত 'Sacrifice in the religions of the world' শিরোনামের রচনার মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: 'Nevertheless, sacrifice is not a phenomenon that can be reduced to rational terms; it is fundamentally a religious act that has been of profound significance to individuals and social groups throughout history, a symbolic act that establishes a relationship between man and the sacred order. For many peoples of the world, throughout time, sacrifice has been the very heart of their religious life.' (Britanica: Online)

প্রকৃতপক্ষে, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, বলিপ্রথা বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মে নানারূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এখনও ইসলাম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এটি অনুমোদিত ও চর্চিত প্রথা। পশুবলির বৈধতা ও অনুমোদন নিয়ে অনেক শ্লোক আছে হিন্দুশাস্ত্রে।[১০] আবার অনেকে লিখেছেন, হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ *বেদে* পশুবলির অনুমোদন নেই। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ভাষাভ্রান্তির জন্য ভুল অনুবাদের মাধ্যমে এবং প্রাচীন শব্দের যথাযথ অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থতার কারণে *বেদ* বা হিন্দুশাস্ত্রে বলি অনুমোদিত, এই মিথ্যে ধারণাটি সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[১১] তবে এ কথা সত্য, বলিদান এমন একটি ঘটনা নয় যা শুধু যুক্তিসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে; এটি মূলত একটি ধর্মীয় কাজ যা ইতিহাস জুড়ে ব্যক্তি এবং সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, একটি প্রতীকী কাজ যা মানুষ এবং পবিত্র ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। বিশ্বের অনেক মানুষের জন্য, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বলিদান তাদের ধর্মীয় জীবনের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একজন রাজা তাঁর রাজ্যে ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বলিপ্রথার বিলোপ ঘোষণা করবেন এবং পুরোহিত ও প্রজাকুল তা সহজে মেনে নেবে—বিশেষত কালগত দিক থেকে যখন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়[১২]—এটি স্বাভাবিক প্রত্যাশার বাইরে। *বিসর্জনে* হয়েছিলও তাই।

৭

রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পক্ষে যুগ যুগ ধরে চলে আসা, বিশেষত ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতে লিখিত অনুমোদপ্রাপ্ত বলিপ্রথা নিজ ঘোষণার মাধ্যমে বিলোপ করা সহজ ছিল না। *বিসর্জন* নাটকের শুরুতেই রানি গুণবতী সন্তান-আকাঙ্ক্ষায় কাতর এবং তিনি মন্দিরে আক্ষেপ করেন:

> আমি হেথা
> সোনার পালঙ্কে মহারানী, শতশত
> দাস-দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
> তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
> লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
> আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
> অনুভব—এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
> এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
> নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
> প্রাণকণিকার তরে।' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ১৫)

নিঃসন্তান মহারানি সন্তান-আকাঙ্ক্ষা থেকে দেবীর উদ্দেশে মানত করেন যে, যদি দেবী কৃপা করে তাকে সন্তান দেন, তাহলে প্রতি বছর একশ মোষ আর তিনশ ছাগ বলি দেবেন। মহারানি বলেছেন:

> এ বৎসর
> পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
> করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
> বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশো মহিষ,
> তিন শত ছাগ। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ১৬)

নাটকের একই অঙ্ক ও দৃশ্যে পৃথক ঘটনায় দেখানো হয়, রাজা গোবিন্দমাণিক্য জয়সিংহকে বলছেন, তারা পূজার জন্য দরিদ্র বালিকা অপর্ণার ছোটো ছাগশিশু কেন ধরে নিয়ে এসেছে? জয়সিংহ বলেছে, এটা সে কী করে জানবে যে, অনুচরেরা বলির পশু কোথা থেকে সংগ্রহ করে! সেই সঙ্গে জয়সিংহ অপর্ণাকে বলে, বিশ্বমাতা তার ছাগশিশুকে গ্রহণ করেছেন, এতে কান্নার কী আছে? এর উত্তরে অপর্ণা যা বলে, তাতেই তৈরি হয় এই নাটকের পরিপ্রেক্ষিত, মানসিকভাবে নবপ্রত্যয়ান্তর হন মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য। মহারাজার সম্মুখেই অপর্ণা জয়সিংহকে বলে:

> কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
> শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
> জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
> বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
> ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে করে
> নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
> করে খাই। আমি তার মাতা।' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ১৭)

এই যে মানুষের পশুপ্রেম এবং নারীর মাতৃভাব—এ দুটো চেতনা অনুভবই গোবিন্দমাণিক্যকে তার ভেতর থেকে বলির বিরুদ্ধে নতুন অবস্থান নিতে প্রেরণা জোগায়। এরপর জয়সিংহের কাছে অপর্ণা যখন শোনে যে, ছাগশিশুটিকে দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়েছে এবং দেবী তা গ্রহণ করেছেন, তখন অপর্ণা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, আর বলে—'মা তাহারে নিয়েছে?/ মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ১৮)। তাই সে আহ্বান জানায়, মন্দির ছেড়ে মানুষের কাতারে এসে দাঁড়াতে। অপর্ণার বক্তব্যে প্রথমে পশুপ্রেম, পরে মাতৃভাব, তার ওপরে বিদ্রোহ, আর শেষে সংস্কার ত্যাগ করে মানবপ্রেমে অবগাহন করার প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে। তার এই প্রত্যয় মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যকে 'বাক্যহীন' করে দেয়; এক নতুন বোধের জন্ম হয় একান্তভাবে রাজার মনে। তিনি শুধু বলেন: 'বৎসে, আমি বাক্যহীন—এত ব্যথা কেন,/ এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ১৮)। এরপর অপর্ণা-জয়সিংহের একাধিক দীর্ঘবাক্য বিনিময় হয়। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের মুখে 'যেথা আছে প্রেম' ছাড়া আর কোনো সংলাপ থাকে না। 'বাক্যহীন' হয়ে এক নতুন বোধে স্নাত হন গোবিন্দমাণিক্য এবং তারই প্রকাশ ঘটে নাটকের ঠিক পরবর্তী দৃশ্যে, যখন পুরোহিত রঘুপতি রাজার ভান্ডার থেকে বলির পশু সংগ্রহ করতে আসেন। তাদের সংলাপ এমন:

> রঘুপতি ॥ রাজার ভান্ডারে
> এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।
> গোবিন্দ ॥ মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
> হইল নিষেধ। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ২০)

রাজার এ ঘোষণায় রাজদরবারের সবাই চমকে ওঠে। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য বলেন, এতোদিন যা হয়েছে (অর্থাৎ বলি) সেটাই বরং বাস্তবসম্মত ছিল না, ছিল স্বপ্ন। দেবী নিজে বালিকার (অপর্ণাকে বুঝিয়েছেন) রূপ ধরে তার চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছেন এবং বলেছেন, জীবরক্ত নয়, প্রেম চান তিনি। রাজার সংলাপ:

> গোবিন্দ ॥ ... এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
> আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি থরে
> স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
> জীবরক্ত সহে না তাঁহার। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ২০)

এরপরই প্রত্যক্ষ সংঘাতের সূচনা হয়; পুরোহিত রঘুপতি রাজসভাতেই সরাসরি রাজাকে প্রশ্ন করেন, 'এতদিন সহিল কী করে?' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ২০)। পুরোহিত ও রাজার এই দ্বন্দ্বই *বিসর্জন* নাটকটিতে রূপায়িত হয়েছে। পুরোহিত রাজাকে আরো বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই টলেননি গোবিন্দমাণিক্য। বরং তিনি ঘোষণা করেন, যারা পূজাচ্ছলে জীবহত্যা করবে তাদের তিনি শাস্তি হিসেবে নির্বাসনদণ্ড দেবেন:

> গোবিন্দ ॥ ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
> মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
> পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
> যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
> পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ২১)

এরপর পুরোহিত ও রাজার বিরোধ শুধু আর রাজসভার অভ্যন্তরে থাকে না, বাইরে তা চরম রূপ ধারণ করে। এই প্লটটি হয়তো রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে পাওয়া, কিন্তু পুরোহিততন্ত্র ও রাজক্ষমতার দ্বন্দ্বের ইতিহাস বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। সাহিত্যেও প্রভাব পড়েছে এর।

৮

প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে দেখা যায়, পুরোহিতদের সন্তানদের থেকে রাজা পরবর্তী পুরোহিত নির্বাচন করতেন এবং এই নির্বাচনেও পুরোহিতদের ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ঘটত। রাজার সম্পত্তি ও কোষাগার থেকে অর্থ ও সম্পদ মন্দিরগুলোতে যেত এবং ক্রমে ক্রমে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল: 'The stele states that the king inducted priests and prophets from the children of the nobles in their towns. We do not know who these were, but they were evidently scions of local priestly families. This stele also illustrates the direction of the flow of wealth in pharaonic Egypt. Money and resources went from the king's estates and treasuries to those of the temples and in the Late Period these offerings were enormous.' (Lisbeth, 2004 : 62)। বিপ্লব-পূর্ব ফ্রান্সে যাজক সম্প্রদায় খুবই শক্তিশালী ছিল এবং ফ্রান্সের প্রায় এক-দশমাংশ জমি ছিল তাদের অধীনে। এই জমির আয় পেত গির্জা অর্থাৎ যাজকগণ, উপরন্তু সাধারণ মানুষের উপর তারা ধার্য করতেন 'ধর্ম-কর'। এই অবস্থায় তৎকালীন রাজা 'আমিই রাষ্ট্র' বা 'আমি যা ইচ্ছা করি, তাই আইন' জাতীয় ধারণা প্রচার করে এবং যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মেলায়। সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতা নিষ্কণ্টক রাখার স্বার্থে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব-পূর্ব যাজক ও রাজাদের পরস্পর সহযোগী হতে দেখা যায়। বাইবেল থেকে কাহিনি নিয়ে সত্যেন সেন *অভিশপ্ত নগরী* (১৩৭৪) ও *পাপের সন্তান* (১৩৭৫) উপন্যাস লিখে সেখানে যথাযথভাবেই দেখিয়েছেন, নবি হিলকিয়া ও নারী-নবি নোয়াদিয়ার আবির্ভাব সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপক্ষে। জেরুশালেমবাসী ধনীদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থের সুদ মওকুফ চাইলে ইহুদি যাজক ইস্রা এর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এভাবেই ক্ষমতা ও পুরোহিততন্ত্র প্রায়শ একবিন্দুতে এসে মেলে। আবার টি এস এলিয়টের কাব্যনাট্য *Murder in the Cathedral* (১৯৩৫)-এ দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি দ্বিতীয় থমাস বেকেটের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন এবং তাকে রাজপ্রাসাদের চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করেন। ১১৬২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা তাকে ক্যানটারবুরি ক্যাথিড্রালের আর্চবিশপ হিসেবে নিযুক্তি দেন এই ভেবে যে, বেকেট রাজাকে সাহায্য করবেন। রাজা চেয়েছিলেন ধর্মীয় আদালত ও গির্জাকে রাজক্ষমতার অধীরে আনতে কিন্তু বেকেট এর প্রতিবাদ করলে রাজা তাকে দেন নির্বাসনদণ্ড। প্রায় ছয় বছর ফ্রান্সে নির্বাসনে থাকার পর ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন বেকেট। তারপরও হেনরি আর বেকেটের দ্বন্দ্ব পরিসমাপ্ত হয় না। অবশেষে ক্যাথিড্রালে চারজন নাইট পাঠিয়ে হেনরি বেকেটকে গুপ্তহত্যা করান। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত টি এস এলিয়টের কাব্যনাট্যটি মূলত ধর্মগুরুর কর্তৃত্ব ও রাজার ক্ষমতার লড়াইয়ের শিল্পরূপ হিসেবে বিবেচিত। *বিসর্জন* নাটকেও মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও পুরোহিত রঘুপতির এমন একটি সখ্যভাব পূর্বাপর

ছিল বলেই ইঙ্গিত মেলে। তাই, রাজা হলেও গোবিন্দমাণিক্য, এমনকি মহারানি গুণবতীর সঙ্গে প্রথাগত সম্মানপ্রদর্শন ছাড়াই খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন এই রাজপুরোহিত। কিন্তু এই সম্পর্ক অস্বাভাবিকত্বে পরিণত হয় যখন গোবিন্দমাণিক্য মন্দিরে জীববলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পরে তাদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে।

পুরোহিততন্ত্র ও রাজক্ষমতার মধ্যে সখ্যভাব ছিল পরস্পরের স্বার্থেই। কিন্তু এই সখ্যভাব বিরোধে পরিণত হয়েছে, সেটিও পরস্পরের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটেছে বলেই। মধ্যযুগে অনেক ক্ষেত্রেই গির্জা ও রাষ্ট্রের একগুঁয়েমি, অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন বিরোধ দানা বেঁধে ওঠে। প্রথম দিকে পারস্পরিক স্বার্থে পোপ ও সম্রাট মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও এগারো শতকে এসে এ সম্পর্কে ফাটল ধরে। এগারো শতকের মধ্যভাগ থেকে বারো শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পোপ ও সম্রাটের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে সংঘাত লক্ষ করা যায়। মনে করা হয়, দেহ ও আত্মার মধ্যে আত্মাই শ্রেষ্ঠ আর পোপগণ সেই আত্মা নিয়ে কাজ করেন বলে পৃথিবীতে তারা শ্রেষ্ঠ। অপর দিকে সম্রাট সবসময় ক্ষমতার অধিকার হিসেবে চার্চের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। দুটি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। কালক্রমে পোপদের অপকার্যকলাপে তাদের ক্ষমতা লোপ পায়। রেনেসাঁস ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পোপতন্ত্রের অবসান হয় পনেরো শতকের প্রথম পর্যায়ে। ইতিহাসের আলোকে লক্ষ করা যায়, কয়েকটি কারণে পুরোহিততন্ত্র ও রাজক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। এগুলো হচ্ছে:

- একই ব্যক্তি পোপ ও রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হওয়া অর্থাৎ পোপ কৌশলে রাজা বনে যাওয়া; বিলাসিতা ও অকর্মণ্যতার কারণে পোপ বা রাজা অথবা দুজনেরই পথভ্রষ্টতা;
- সামন্তপ্রভুদের স্বাধীনতা; বিষয়-সম্পত্তি তদারকির কাজে প্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যর্থতা;
- ধর্মালয়ের বিপুল সম্পত্তির উপর রাজার করারোপ; রাজপ্রাসাদ কর্তৃক পুরোহিতদের আয় ও সামাজিক ক্ষমতা হ্রাসকরণ;
- সামন্তপ্রভু ও পুরোহিত উভয় পক্ষ মিলে রাজার সম্পদ লুট ও জবরদখল ইত্যাদি।

বিসর্জন নাটকে দেখা যাবে, উপরিউক্ত কারণসমূহের মধ্যে 'রাজপ্রাসাদ কর্তৃক পুরোহিতদের আয় ও সামাজিক ক্ষমতা হ্রাসকরণ' কারণটি কার্যকর আছে। সমন্বয়বাদী বিশ্লেষকগণ পুরোহিততন্ত্র ও রাষ্ট্রক্ষমতার *ঐক্যই* কামনা করেন এবং তা জনহিতে প্রয়োগের পক্ষে বলেন। এই পুনর্মিলনের প্রক্রিয়াগুলিকে টেকসই করার জন্যে শান্তি, ন্যায়বিচার, করুণা ও সত্যের উপর পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা: 'Processes of reconciliation must pay adequate attention to peace, justice, mercy, and truth in order to be sustainable.' (Christine, 2021 : 114)

৯

যুক্তিশীল মানুষগুলোকে 'নাস্তিক' বলে গালমন্দ করা শুধু আজকের প্রবণতা নয়, এই প্রবণতা বহু পুরোনো; মধ্যযুগীয়। তাই, *বিসর্জন* নাটকেও দেখা যাচ্ছে, গোবিন্দমাণিক্যকে

'পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ২১) বলে প্রকাশ্য-ভর্ৎসনা করে রাজপুরোহিত রঘুপতি রাজসভা ত্যাগ করেন। কিন্তু রাজসভা ত্যাগ করেই রঘুপতি শান্ত থাকেন না, বরং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কারণ, তিনি অনুধাবন করতে পারেন, মন্দিরে বলিপ্রথা চিরতরে রদ হলে তার আয়, প্রভাব, ক্ষমতা সবই খর্ব হবে। রঘুপতি এক্ষেত্রে মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও সংস্কারাচ্ছন্নতা কাজে লাগাতে চান। বলিবন্ধের বিপক্ষে রাজ্যের সেনাপতি, দেওয়ান, মন্ত্রী গোবিন্দমাণিক্যকে যুক্তি দেয়। তারা বলে, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রথা পাপ নয়, তাই এটি বন্ধ করার দরকার কী? নাটকে আছে:

নয়নরায় ॥ ক্ষমা করো অধীনের
স্পর্ধা মহারাজ। কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—
চাঁদপাল ॥ শান্ত হও সেনাপতি।
মন্ত্রী ॥ মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না?
গোবিন্দ ॥ আর নহে মন্ত্রী,
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।
মন্ত্রী ॥ পাপের কি এত পরমায়ু হবে?
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল,
সে কি পাপ হতে পারে? (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ২২)

ধর্মীয় আবেগ ও সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে রাজপরিবার ও রাজদরবার কোনোটাই মুক্ত নয়, এটা ভালোভাবেই জানতেন পুরোহিত রঘুপতি। তাই তিনি ক্রমান্বয়ে এদের স্বপক্ষে টেনে নেন। রাজমন্দিরের সেবক ও পুত্রজ্ঞানে পালিত রাজপুত যুবক জয়সিংহকে নিজপক্ষে টেনে আনার জন্য বলেন, গোবিন্দমাণিক্য দেবীকে অপমান করেছেন:

জয়সিংহ ॥ ... প্রভু, কারে অপমান?
রঘুপতি ॥ কারে! তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মা'র পূজা-বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে!
জয়সিংহ ॥ গোবিন্দমাণিক্য! (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ২৮)

রানি গুণবতীকেও প্রভাবিত করেন পুরোহিত। রানির সামনে অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে স্বীয় পৈতা ছিঁড়ে ফেলার ভান করে রঘুপতি গুণবতীর আবেগে আঘাত করেন এবং তার কাছে অনুরোধ জানান 'ব্রাহ্মণের অধিকার' ফিরিয়ে দেওয়ার:

রঘুপতি ॥ ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।
গুণবতী ॥ দিব।
যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ৩৪)

রানির কাছে ‘ব্রাহ্মণের অধিকার’ ফিরে চাওয়া আদপে নিজের আয়, প্রভাব, ক্ষমতা যাতে নষ্ট না হয়—সেগুলোই চাওয়া। রঘুপতি গুণবতীকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারেন। সেনাপতি নয়নরায়কে রঘুপতি প্রভাবিত করতে চান:

> রঘুপতি ॥ শুন তবে সেনাপতি,
> তোমার সকল বল করো একত্রিত
> মা'র কাজে। নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ৪০)

এ সময় রাজার বিরুদ্ধে জনগণকেও উত্তেজিত করার পরিকল্পনা চলে, যা প্রকাশ পায় রঘুপতি ও জয়সিংহের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় অথবা প্রজাদের সঙ্গে রঘুপতির কথায়। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ৪২, ৭৪)

পুরোহিত রঘুপতি জানেন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হলে তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে হবে না, অস্ত্র লাগবে: ‘সে কাল গিয়েছে।/ অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়’ (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ৪৪)। তাই তিনি অস্ত্রের জোগান দিতেও প্রস্তুত। মন্দিরে স্বরবিকৃত করে দেবীর আদেশের নামে নিজে দেন নির্দেশ-সম্মতি। এটি নির্ভেজাল কপটতা। পুরোহিত হয়ে এমন কপটতার আশ্রয়ও নেন রঘুপতি। অবশেষে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করে রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে সিংহাসনে বসানোর প্রলোভন দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন পুরোহিত:

> রঘুপতি ॥ স্থির
> হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল—
> বুঝেছ কি? শোনো তবে—গোপনে তাঁহারে
> বধ করে, আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
> দেবীর চরণে। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ৫১)

এক্ষেত্রে ধর্মের নামে পুরোহিত রঘুপতি মানবহত্যাকেও বৈধ ঘোষণা করেন, এভাবে: ‘আর-এক শিক্ষা দিই।/ পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা/ আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!/ এ জগৎ মহা হত্যাশালা’ (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: ৫৩)। রঘুপতিকে যে এ নিয়ে বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি, তা নয়। জয়সিংহ নিজেই ভাইকে দিয়ে ভ্রাতৃহত্যার কথা শুনে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যেহেতু, রঘুপতি জয়সিংহকে সন্তানের মতো বড়ো করেছেন, সেহেতু জয়সিংহকে নিবৃত্ত করা রঘুপতির জন্য কঠিনই ছিল। ঐ বাধাও অতিক্রম করেন তিনি। স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যান পুরোহিত। কিন্তু ধ্রুবকে দেবীর উদ্দেশে বলি দেওয়ার সময় নক্ষত্ররায় ও রঘুপতির বন্দি হওয়া, বিচারে নির্বাসনদণ্ড পাওয়া ইত্যাদি নাটকের ঘটনায় জটিলতা সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে মোগল সেনাদের কল্যাণে রঘুপতির পছন্দ নক্ষত্ররায় রাজা হয়, গোবিন্দমাণিক্য হন সিংহাসনচ্যুত। রঘুপতি দেবীর জন্য ‘রাজরক্ত’ চেয়েছিলেন জয়সিংহের কাছে। এখন ব্যাপারটি আরো সহজ। কারণ, গোবিন্দমাণিক্য আর রাজা নন। তার নিরাপত্তাব্যবস্থাও শিথিল। কিন্তু জয়সিংহ সিংহাসনচ্যুত গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত না নিয়ে ছুরিকাহত হয়ে নিজের রক্তে রক্তাক্ত করে মন্দিরের বেদী। কারণ, তার শরীরেও ‘রাজরক্ত’ বইছিল। জয়সিংহের আত্মহত্যা রঘুপতির মনে তীব্র নাটকীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তিনি নিজহাতে দেবীপ্রতিমা বিসর্জন দিয়ে মানবী অপর্ণার মধ্যে

মাতৃদর্শনে নিবিষ্ট হন। উল্লিখিত 'তীব্র নাটকীয় প্রতিক্রিয়া'র পূর্বপর্যন্ত পুরোহিততন্ত্র রাজক্ষমতার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে যায়।

বিসর্জন নাটকে রাজক্ষমতার আধিকারিক গোবিন্দমাণিক্যের পক্ষে নিজ অবস্থানে স্থির থাকা খুবই কঠিন ছিল। কারণ, তার ধর্মীয় পুস্তকগুলোতে বলিপ্রথার অনুমোদন রয়েছে। ধর্মে অনুমোদন রয়েছে, প্রজা আমাত্য রাজরানি প্রমুখের আবেগ ও অনুসমর্থন আছে, আর আছে পুরোহিততন্ত্রের প্রবল বিরোধিতা—এমন একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্কার যত নিষ্ঠুরই হোক, এর বিরুদ্ধে শুধু রাজা ও তার ক্ষমতার পেরে ওঠা প্রকৃত অর্থে বেশ কঠিনই। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য মাথা নত করেননি, নিজ ব্যক্তিত্ব জাগরূক রেখেছেন। স্ত্রী গুণবতীর আবেগের কাছে নিজের প্রতিজ্ঞাকে তিনি দ্রবীভূত হতে দেননি; আমাত্যদের প্রথাগত পরামর্শ কানে নেননি; রাজপদ রক্ষা করতেই হবে—শুধু এজন্য ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লড়তে যাননি; সর্বোপরি পুরোহিত রঘুপতির কথা মেনে নিয়ে জীববলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি অথবা করেননি তার সঙ্গে কোনো আপস। নাটকে ভিখারিনি বালিকা অপর্ণার আকুতির মধ্য দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে পশুবলির বিরুদ্ধে প্রেমভাব জাগ্রত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হলেও, বলিবিরোধী তার এ অবস্থানকে মূলত দেউলের বিরুদ্ধে রাজপ্রাসাদের (Church versus Palace); পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজক্ষমতার (Priesthood versus Royel power) দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিসর্জন নাটকে এই লড়াই বা দ্বন্দ্বে অবশেষে পুরোহিততন্ত্রের পরাজয় ঘটেছে—*রাজর্ষি*তেও তাই।

১০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনাকে প্লট হিসেবে গ্রহণ করে, ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে লেখা *রাজর্ষি* ও ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা *বিসর্জনে* প্রকাশ করেন: যে কোনো কারণেই হোক ধর্মের নামে জীববলি অগ্রহণযোগ্য। আহমদ শরীফ লিখেছেন, নিরাকার ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা ও পশুবলির অসারতা প্রতিপাদনে একাগ্রচিত্ত ছিলেন বলেই এভাবে লিখতে পেরেছেন (আহমদ ২০১৪: ১০৬)। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো বড়ো ব্রাহ্ম, যাঁরা মূলত ব্রাহ্মনেতা—রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (১৮৬৮-১৯১৩) প্রমুখ কিন্তু বলিবিরোধী অবস্থান এভাবে গ্রহণ করেননি। শুধুই ব্যক্তিগত ধর্মীয় অবস্থানের কারণে রবীন্দ্রনাথ বলিবিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন, এমনটি ভাবা তাই কঠিন। তা ছাড়া তিনি এরই মধ্যে যে দুটো প্রতিষ্ঠানের (দেউল ও রাজপ্রাসাদ) ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন, তারই-বা ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত ধর্মচর্চায় মিলবে কীভাবে! বলতে হয়, সতেরো শতকেতো বটেই, ১৮৮৭ বা ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পূজাকেন্দ্রে যখন ব্যাপকভাবে জীববলি চলছিল, তখন বলিবিরোধী এমন অবস্থান নেওয়া খুব সহজ কর্ম ছিল না। *রাজর্ষি*তে যা ছিল অনুষঙ্গ, *বিসর্জনে* সেটাই হয়ে ওঠে মুখ্য বিবেচনা। আর এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে এর স্বরূপ উন্মোচনে হন সফল। উপন্যাস ও নাটক—দুটো ক্ষেত্রেই ঘটনাকেন্দ্র হলো ত্রিপুরা। *বিসর্জন* লেখার ১২৯ বছর পর (২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ) একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে এবং তাহলো: Tripura HC bans animal sacrifice in temples with immediate effect.[১৩] অর্থাৎ হাইকোর্ট *রাজর্ষি* ও *বিসর্জন* সৃষ্টিকর্মের কেন্দ্রভূমি ত্রিপুরায়

বলিপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য বলি নিষিদ্ধ করেছিলেন একটিমাত্র মন্দিরে, এখন বন্ধ হলো মন্দিরগুলোতে। পৃথিবীতে বহু ধর্মে ধর্মের নামে জীববলির রীতি একদা প্রচলিত বা আবশ্যিক থাকলেও পরবর্তীকালে তা রহিত বা বিলোপ হয়েছে। এর একটি সূচনা নিশ্চয়ই ছিল। উল্লিখিত সংবাদটিও ঐতিহাসিক কোনো সূচনার ইঙ্গিত নিশ্চয়!

টীকা

১. '*যোগাযোগ* উপন্যাস বেরবার পর থেকে তার দ্বিতীয় খণ্ড লেখবার জন্যে তাগিদ লেগেই ছিল। কিন্তু মন বসিয়ে কোনোটাই লেখবার আর সময় হল না।

অভিনয়ের জন্যে অন্যের লেখা *যোগাযোগ*-এর নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপি নিয়ে শিশির ভাদুড়ি মশায় একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কবির কাছে। কবি স্থানে স্থানে তা সংশোধন করে দেন। দু-তিন খানা গানও লিখে দেন। নূতন লেখা অংশগুলো ওঁদের কপি করে দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত আনবার জন্যে লেখককে [সুধীরচন্দ্র কর] নাট্যাচার্যের [শিশির ভাদুড়ি] সঙ্গে যেতে হয়েছিল কলকাতায়। সে যাত্রায় ভাদুড়ি মশায় সিংহসদনে সেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে শোনান।

মালঞ্চ উপন্যাসখানিকে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে শান্তিনিকেতনে একবার অভিনয় করবার কথা হয়। এমনিতেই সমস্তটা বই কথাবার্তায় ভরানো। অধ্যায়গুলোকে দৃশ্য করে বর্ণনার অংশগুলোকে প্রযোজনার নির্দেশের মধ্যে ভরে দেওয়া গেল। কথাবার্তার অংশ প্রায় যথাযথাই রইল; এই করে তিন-চার খানা একসারসাইজ বুক-এ *মালঞ্চ*-এর নাট্যরূপ দাঁড় করানো হল। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত আর অভিনীত হয়নি। যোগাযোগ এবং মালঞ্চ-এর উপরোক্ত পাণ্ডুলিপি দুটি রবীন্দ্রভবনের রক্ষিত আছে' (সুধীরচন্দ্র ১৯৫১: ৪০)। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক দশক পরেও রবীন্দ্রভবনের সংরক্ষণশালায় সংরক্ষিত থাকা পাণ্ডুলিপি দুটো ছাড়া *বউ ঠাকুরানীর হাট*, *রাজর্ষি*, *প্রজাপতির নির্বন্ধ* উপন্যাস অবলম্বনে পৃথক নামে রবীন্দ্র-রচিত *প্রায়শ্চিত্ত*, *বিসর্জন*, *চিরকুমার সভা* তাঁর সৃষ্টিজগতে পৃথক শিল্পকর্ম হিসেবেই স্বীকৃত।

২. এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) লিখেছেন, 'সাহাজাদপুরে যাইবার সময় *রাজর্ষি* একখণ্ড সঙ্গে লইলেন, বোধ হয় তখনই মনে মনে গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনী লইয়া নাটক রচনার সংকল্প গ্রহণ করেন। সাহাজাদপুরের কাছারিবাড়িতে একা আছেন—স্ত্রীর নিয়মিত পত্র লেখার অভ্যাস নাই। সন্তানদের জন্য কবির মন উতলা হয়, কিন্তু উপায় নাই। গম্ভীর মুখে জমিদারির কাজ ও জমিদার পদাধিকার-বলে পাঁচ রকমের জনহিতকর কাজের মধ্যে লিপ্ত হইতেই হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় উপস্থিত হইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদের বক্তৃতা শ্রবণ, ভাষণ দান প্রভৃতি কার্য কর্তব্যবোধে নিষ্পন্ন করিতে হয়' (প্রভাতকুমার ১৩৯২: ২৮২)। রবীন্দ্রনাথের পৃথক একটি পত্রের সূত্রে প্রভাতকুমার আরো উল্লেখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তিনি একটি বই লিখতে বসেছেন। আর তাই প্রভাতকুমারের সিদ্ধান্ত: '... আমরা কয়েকটি তথ্য জানিতে পারিলাম—প্রথমত *রাজর্ষি* পাঠ্যপুস্তক রূপে চালাইবার চেষ্টা; দ্বিতীয়ত *রাজর্ষি* সঙ্গে লইয়াছিলেন বিসর্জন নাটক লিখিবার জন্য; সেই নাটকটি লিখিতেছেন। (১৩৯২: ২৮৩)

৩. তোরি হাতে বাঁধা খাতা তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।

দীর্ঘ এই উৎসর্গ-কবিতার মধ্যবর্তী স্থানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ছোটোদের আবদার মেটানোর জন্য তিনি খাতায় নাটক লিখে সাহাজাদপুর থেকে কলকাতায় ঠিকই নিয়ে যাচ্ছেন—

সম্মুখে দাঁড়াব যবে 'কী এনেছ' বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের করে বলিব 'এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ'।

(রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৯: উৎসর্গ-কবিতা)

৪. '১৮৮৫। (১২৯১-৯২) ॥ (১৮০৬-০৭ শক) বয়স ২৪। [...] [...]: এপ্রিল (বৈশাখ ১২৯২): হইতে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত *বালক* মাসিকপত্র প্রকাশ; রবীন্দ্রনাথের উপর কর্মভার অর্পণ। এক বৎসরে কবিতা, প্রবন্ধ, পত্রাবলী, হাস্যকৌতুক, শ্যারাভ জাতীয় নাট্য, *মুকুট* নামে ছোটো উপন্যাস, *রাজর্ষি* নামে একটি বড়ো উপন্যাস প্রকাশিত হয়।' (প্রভাতকুমার ২০০৭: ২৪)

৫. রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত (পুনর্মুদ্রণ ২০১১) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা (১৯৬১) গ্রন্থে সত্যরঞ্জন বসু 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি' প্রবন্ধে ত্রিপুরাতে রবীন্ত্রনাথের গমনের তারিখ উল্লেখ করেছেন ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। কিন্তু প্রশান্তকুমার পাল *রবিজীবনী* ৪র্থ খণ্ডে জানিয়েছেন, তারিখটি ঠিক নয়। তিনি নিজেও নিশ্চিত হয়ে কোনো তারিখ জানাতে পারেননি। তবে, তিনি প্রাসঙ্গিক পত্রাবলি বিশ্লেষণ করে জানাচ্ছেন, ১৩০৫ বঙ্গাব্দের দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আগরতলায় আয়োজিত বসন্তোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন এবং দোলপূর্ণিমার তারিখটি ছিল ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ। নিশ্চয়ই, ঐ দিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু কবে তিনি ত্রিপুরার মাটিতে পৌঁছেন, সে তথ্য প্রশান্তকুমার পাল দিতে পারেননি। এমনকি ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে কবে রবীন্দ্রনাথ রওনা হয়েছিলেন, সে তথ্যও অজানা। প্রশান্তকুমার লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবে ত্রিপুরা যাত্রা করেন বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই' (২০২০: ২১৬)। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি* (২০০৭) গ্রন্থেও এ ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু বিকচ চৌধুরী *উত্তর-পূর্ব ভারত ও রবীন্দ্রনাথ* (২০১০) গ্রন্থে কোনো সূত্র বা প্রমাণ উল্লেখ না করেই লিখেছেন, '১৮৯৯ সালের ২৭ মার্চ (১৪ চৈত্র, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ প্রথম ত্রিপুরায় আসেন মহারাজা রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে' (বিকচ ২০১০: ২৬)। মনে হয়, প্রশান্তকুমার পালের সূত্র ধরেই বিকচ চৌধুরী দোলপূর্ণিমা অনুষ্ঠানের দিনকে বিবেচনাহীনভাবে রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা-গমনের তারিখ বলে ঘোষণা করেছেন।

৬. 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর দেওয়ানীপ্রাপ্তির চারি বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র ব্রিটীশ সিংহের কুক্ষিগত হইয়াছিল। লিক সাহেব ত্রিপুরার প্রথম রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত হন।' (কৈলাসচন্দ্র ১৩০৩: ১২৯)

৭. শ্রাবণ, ১৩৪৭-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *রাজর্ষি*র একটি প্রাক-কথন যুক্ত করেন 'সূচনা' নাম দিয়ে। সেখানে তিনি লেখেন: '*বালক* পত্রের সম্পাদিকা আমাকে ঐ মাসিকের পাতে নিয়মিত পরিবেশনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল হল এই যে, প্রায় একমাত্র আমিই হলুম তার ভোজের জোগানদার। ... মাসিকপত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।' (রবীন্দ্রনাথ ১৯৮০ক: ৩৪২)

৮. Nachiketa Bandyopadhyay, Jainism and Human–Animal Relationship, Buddhism and Jainism in Early Historic Asia, 2017. এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, জৈনরা প্রাণী থেকে উৎপন্ন বা তৈরিকৃত বস্তুসামগ্রীও ব্যবহার করেন না। জৈন ধর্ম তার আন্তঃসংযুক্ত জীবের সৃষ্টিতত্ত্ব,

অহিংসার প্রতি জোর, প্রকৃতির পরিবেশগত উদ্বেগ, বনসংরক্ষণ, জীবনরূপ, সম্পদের অবক্ষয়, তথাকথিত আমিষবাদ এবং ভোগবাদের মাধ্যমে জৈবকেন্দ্রিক বিশ্বের অবস্থান্তর প্রকাশ করে: 'Jainism promotes biocentric world view through its cosmology of interconnected Jiva, insistence on nonviolence, ecological concern of nature, forest conservation, life forms, depletion of resources, non-vegetarianism, and consumerism.' সূত্র: https://www.academia.edu/68660852

৯. Ranjani Malawi Pathirana 'Buddhist attitudes towards animal sacrifice' শিরোনামে লিখেছেন, বৌদ্ধ মতে সংবেদনশীল প্রাণীদেরও পুনর্জন্ম নিতে হয় এবং তাই তাদের হত্যা করা নিষেধ: 'The Buddhist faith also teaches that sentient beings are subject to rebirth as other sentient beings, and that consciousness cannot be killed.' সূত্র: https://www.researchgate.net/publication/363485417

১০. 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পোর্টালে প্রকাশিত 'পুরাণে পশুবলি' শিরোনামে কুশলবরণ চক্রবর্ত্তীর লেখায় মনুসংহিতা, ভাগবত, পুরাণ, মহাভারত, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ইত্যাদিতে পশুবলির সপক্ষে যে শ্লোক বা বাণী আছে, তার বিস্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্র: https://www.xn--45baaj2aiao5xbdb.com/2022/05/blog-post_55.html

১১. Purnesh 'Animal Sacrifice in the Vedas?' প্রবন্ধে একে 'Lost in translation' বলেছেন। প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে: 'These days there are many ancient practices that are misunderstood, misinterpreted or dismissed as unscientific. One such example is the practice of Pashu Bali in the Vedic Tradition, which refers to the 'sacrificing of one's own animalistic tendencies'—a word and practice often (wrongly) translated and interpreted as 'animal sacrifice.' বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: https://purnesh.co/animal-sacrifice-in-the vedas/

১২. রাজা গোবিন্দমাণিক্য (?-১৬৭৬) ১৬৬০ থেকে ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৬৬৭ থেকে ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজা ছিলেন।

১৩. 'Tripura HC bans animal sacrifice in temples with immediate effect': The Tripura High Court has banned sacrifice of animals and birds in temples with immediate effect and directed the state government to earmark land for opening shelter home for rearing livestock donated by devotees at these temples. — *The Indian Express*, 27th September 2019.

সহায়কপঞ্জি

আহমদ শরীফ (২০১৪)। *রবীন্দ্র-ভাবনা*। ঢাকা: বিভাস

কৈলাসচন্দ্র সিংহ (১৩০৩)। *রাজমালা* (যেগেশচন্দ্র সিংহ প্রকাশিত)। প্রকাশস্থান অনুল্লেখিত

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৯২)। *রবীন্দ্রজীবনী* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৭)। *রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

প্রশান্তকুমার পাল (২০২০)। *রবিজীবনী* চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স

বিকচ চৌধুরী (২০১০)। 'উত্তরপূর্ব ভারত ও রবীন্দ্রনাথ', *এবং মুশায়েরা*। কলকাতা

ভূদেব চৌধুরী (১৯৮৪)। *রবীন্দ্র-উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৮)। *রাজর্ষি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮০ক)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ১ম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮০খ)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ২য় খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৮৮)। *জীবনস্মৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৯)। *বিসর্জন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও অন্যান্য (১৪০৫)। *সর্বজনের রবীন্দ্রনাথ* (সম্পাদিত)। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সত্যরঞ্জন বসু (২০১১)। 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি', *রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা* (গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত)। আগরতলা

সুকুমার সেন (১৯৫২)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* রবীন্দ্রনাথ খণ্ড (৩য় খণ্ড)। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি

সুধীরচন্দ্র কর (১৯৫১)। *কবি-কথা*। কলকাতা: সুপ্রকাশন

Christine Schliesser & Other (2021). 'Religion In Post-genocide', *On the significance of religion in conflict and conflict resolution* (Edited). New York: Routledge

Lisbeth S. Fried (2004). *The priest and the great king: Temple-Palace Relations in the Persian Empire*. US: Eisenbraun

Maria-Zoe Petropoulou. 'Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200', (https://www.researchgate.net/publication/287004309)

https://www.britannica.com/topic/sacrifice-religion/Sacrifice-in-the-religions-of-the-world